মিঠেকড়া

সুকান্ত ভট্টাচার্য

বড়োরা অবাক হয় সুকান্তর কবিতা পড়ে। এবার সুকান্তর ছড়া পড়ে অবাক হবে ছোটরা। আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির ছড়া নয়, একেবারে একালের টাট্‌কা হাতে-গরম ছড়া। হাসতে হাসতে হঠাৎ হাত মুঠো হয়ে যাবে রাগে, চোখ দুটো জ্বলে উঠবে লাল-টক্‌টকে সূর্য-ওঠা দিনের কথা ভেবে। এমন ছড়া বাংলা দেশে আর কেউ লেখে নি।

কলকাতার রাস্তায় বিষম এক খেলা। বন্দুকের সঙ্গে শুধু হাতের লড়াই। আশ্চর্য! এমন এক সাংঘাতিক কাণ্ড তার মধ্যেও মজা পেয়েছে সুকান্ত। গোটা বইতে এমনি সব মিঠে রসে ভেজানো কড়া পাকের ছড়া। সুকান্তই নিজে তাই তার বইয়ের নাম দিয়েছিল 'মিঠেকড়া'।

'পৃথিবীর দিকে তাকাও'—এই ছড়াটি একটি ইংরেজি কবিতার ভাবানুসরণে লেখা। বত্রিশ পৃষ্ঠার ছবিটি একটি বিদেশী ছবির ভাবাবলম্বনে আঁকা।

'মিঠেকড়া'র ছবিগুলি এঁকেছেন শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। সুকান্ত এই ছড়াগুলো লেখার পর ছবি আঁকার জন্যে তাঁরই হাতে প্রথম দেয় এবং এ বইয়ের পরিকল্পনা দুজনে মিলে করে। এতদিন পরেও দেবব্রতবাবু সুকান্তর মনের কথা যেভাবে ছবির রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে তাঁকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। সুকান্ত এ বই দেখলে কী খুশিই যে হ'ত।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

তোমরা আমায় নিন্দে ক'রে দাও না যতই গালি,
আমি কিন্তু মাখছি আমার গালেতে চূণকালি,
কোনো কাজটাই পারি নাকো ব'লতে পারি ছড়া,
পাশের পড়া পড়ি না ছাই পড়ি ফেলের পড়া।
তেতো ওষুধ গিলি নাকো, মিষ্টি এবং টক
খাওয়ার দিকেই জেনো আমার চিরকালের সখ।
বাবা-দাদা সবার কাছেই গোঁয়ার এবং মন্দ
ভালো হ'য়ে থাকার সঙ্গে লেগেই আছে দ্বন্দ্ব।
প'ড়তে ব'সে থাকে আমার পথের দিকে চোখ,
পথের চেয়ে পথের লোকের দিকেই বেশি ঝোঁক।
স্কুলের কেয়ার করি নাকো মধুর জন্যে ছুটি,
যেখানে ভিড় সেইখানেতেই লাগাই ছুটোছুটি।
পণ্ডিত এবং বিজ্ঞজনের দেখলে মাথা নাড়া
ভাবি উপদেশের ষাঁড়ে ক'রলে বুঝি তাড়া।
তাই তো ফিরি ভয়ে ভয়ে, দেখলে পরে তর্ক,
বুঝি কেবল গোময় সেটা,—নয়কো মধুপর্ক।
ভুল করি ভাই যখন তখন, শোধ্‌রাবার আহ্লাদে
খেয়ালমতো কাজ ক'রে যাই, কষ্ট পাই কি সাধে ?
সোজাসুজি যা' হয় বুঝি, হায় অদৃষ্ট চক্র !
আমার কথা বোঝে না কেউ ,পৃথিবীটাই বক্র॥

এক যে ছিল।

এক যে ছিলো আপন ভোলা কিশোর,
ইস্কুল তার ভালো লাগতো না,
সহ্য হ'তো না পড়াশুনার ঝামেলা
আমাদের চলতি লেখাপড়া সে শিখলো না কোন কালেই,
অথচ সে ছাড়িয়ে গেলো সারা দেশের সবটুকু পাণ্ডিত্যকে।
কেমন ক'রে ? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না॥

বড়োমানুষীর মধ্যে গরীবের মতো মানুষ,
তাই বড়ো হ'য়ে সে বড়ো-মানুষ না হ'য়ে
মানুষ হিসেবে হ'লো অনেক বড়ো।
কেমন ক'রে ? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না॥

গানসাধার বাঁধা আইন সে মানেনি,
অথচ স্বর্গের বাগান থেকে সে চুরি ক'রে আনলো
তোমার আমার গান।
কবি সে, ছবি আঁকার অভ্যাস ছিলো না ছোট বয়সে,
অথচ শিল্পী ব'লে সে-ই পেলো শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সম্মান।
কেমন ক'রে ? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না॥

মানুষ হ'লো না ব'লে যে ছিলো তার দিদির আক্ষেপের বিষয়,
অনেক দিন, অনেক বিদ্রূপ যাকে ক'রছে আহত ;
সে-ই একদিন চমক লাগিয়ে ক'রলো দিগ্বিজয়।
কেউ তাকে ব'ললো, 'বিশ্বকবি', কেউবা 'কবিগুরু'
উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চারদিক ক'রলো প্রণাম।
তাই পৃথিবী আজো অবাক হ'য়ে তাকিয়ে ব'লছে :
কেমন ক'রে ? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না,
এ প্রশ্নের জবাব, তোমাদের মতো আমিও খুঁজি॥

ভেজাল

ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়,
ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিষ মিলবে নাকো চেষ্টায়।
ভেজাল তেল আর ভেজাল চাল, ভেজাল ঘি আর ময়দা,
'কৌন ছোড়ে গা ভেজাল ভেইয়া, ভেজাল সে হ্যয় ফয়দা।'
ভেজাল পোষাক, ভেজাল খাবার, ভেজাল লোকের ভাবনা,
ভেজালেরই রাজত্ব এ পাটনা থেকে পাবনা।
ভেজাল কথা—বাংলাতে ইংরেজি ভেজাল চ'লছে,
ভেজাল দেওয়া সত্যি কথা লোকেরা আজ ব'লছে।
'খাঁটি জিনিষ' এই কথাটা রেখো না আর চিত্তে,
'ভেজাল' নামটা খাঁটি কেবল আর সকলই মিথ্যে।
কলিতে ভাই 'ভেজাল' সত্য ভেজাল ছাড়া গতি নেই,
ছড়াটাতেও ভেজাল দিলাম, ভেজাল দিলে ক্ষতি নেই॥

গোপন খবর

শোনো একটা গোপন খবর দিচ্ছি আমি তোমায়,
ক'লকাতাটা যখন খাবি খাচ্ছিলো রোজ বোমায়,
সেই সময়ে একটা বোমা গড়ের মাঠের ধারে,
মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গিয়ে ছিলো একেবারে,
অনেক দিনের ঘটনা তাই ভুলে গেছ্‌লো লোকে,
মাটির ভেতর ছিলো তাইতো দেখেনি কেউ চোখে,
অনেক বর্ষা কেটে গেলো, গেলো অনেক মাস,
যুদ্ধ থামায় ফেললো লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস,
হঠাৎ সেদিন একলা রাতে গড়ের মাঠের ধারে
বেড়িয়ে ফেরার সময় হঠাৎ চ'মকে উঠি : আরে !
বৃষ্টি পেয়ে জন্মেছে এক লম্বা বোমার গাছ,
তারই মাথায় দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোর নাচ,
গাছের ডালে ঝুলছে কেবল বোমাই সারি সারি,
তাই না দেখে ভ'ড়কে গিয়ে ফিরে এলাম বাড়ি।
পরের দিনই সকাল বেলা গেলাম সে ময়দানে,
হায়রে !—গাছটা চুরি গেছে···কোথায় কে তা জানে
গাছটা ছিলো। গড়ের মাঠে খুঁজতে আজো ঘুরি,
প্রমাণ আছে অনেক, কেবল গাছটা গেছে চুরি ॥
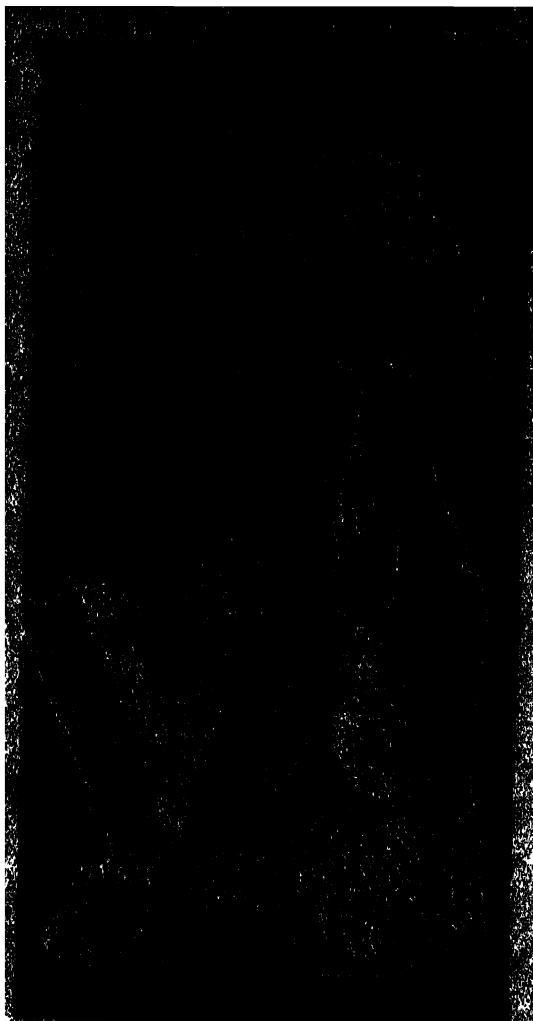
জ্ঞানী

বরেনবাবু মস্ত জ্ঞানী, মস্ত বড় পাঠক,
পড়েন তিনি দিন রাত্তির গল্প এবং নাটক,
কবিতা আর উপন্যাসের বেজায় তিনি ভক্ত,
ডিটেকটিভের কাহিনীতে গরম করেন রক্ত ;
জানেন তিনি দর্শন আর নানা রকম বিজ্ঞান
জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন তিনি, তাইতো আছে দিক্‌জ্ঞান ;
ইতিহাস আর ভূগোলেতে বেজায় তিনি দক্ষ,—
এসব কথা ভাবলেই তাঁর ফুলতে থাকে বক্ষ।
সব সময়েই পড়েন তিনি, সকাল থেকে সন্ধ্যে,
ছুটির দিনে পড়েন তিনি, পড়েন পূজোর বন্ধে।
মাঝে মাঝে প্রকাশ করেন গূঢ় জ্ঞানের তত্ত্ব
বিদ্যাখানা জাহির করেন বরেন্দ্রনাথ দত্ত :
হঠাৎ ঢুকে রান্না ঘরে বলেন, ওসব কী রে ?
ভাইঝি গীতা হেসে বলে, এসব কালো জিরে।
বরেনবাবু রেগে বলেন, জিরে তো হয় সাদা,
তিলও কালো, জিরেও কালো ? পেয়েছিস কি গাধা ?
রান্না করার সময় কেবল পুড়িয়ে হাজার লঙ্কা,
হনুমতী হ'য়েছিস তুই, হ'চ্ছে আমার শঙ্কা।
হঠাৎ ছোট্ট খোকাটাকে কাঁদতে দেখে, দত্ত
খোলেন বিরাট বইয়ের পাতা নামটি—"মনস্তত্ত্ব"।
খুঁজতে খুঁজতে বরেনবাবু হ'য়ে গেলেন সারা—
বুঝলেন না, কেন খোকা মাথায় ক'রছে পাড়া।
হঠাৎ এসে ভাইঝি গীতা দুধের বাটি নিয়ে,
খাইয়ে দিয়েই পাঁচ মিনিটে দিলো ঘুম পাড়িয়ে
বরেনবাবু ভাবেন, খোকার কেমন তরো ধারা,
আধ ঘণ্টার চেঁচামেচি পাঁচ মিনিটেই সারা ?

জ্ঞানী

বরেনবাবুর কাছে আরো বিরাট একটি ধাঁধা,
হ'লদে চালের রঙ কেন হয় ভাত হ'লে 'পর সাদা ?
পাথর বাটির গরম জিনিস ঠাণ্ডা হয় তা' জানি,
পাহাড় দেশে গরম কেন এমন ছট্‌ফটানি ?
পথ চ'লতে ভেবে এসব ভিজে ওঠেন ঘামে,
মানিকতলা যেতে চাপেন ধর্মতলার ট্রামে।
বরেনবাবু ; জানেন কিন্তু নানা রকম বিজ্ঞান,
জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন তিনি তাইতো এমন দিক্‌-জ্ঞান

মেয়েদের পদবী

মেয়েদের পদবীতে গোলমাল ভারী,
অনেকের নামে তাই দেখি বাড়াবাড়ি ;
'আ'কার অন্ত দিয়ে মহিলা করার
চেষ্টা হাসির। তাই ভূমিকা ছড়ার।
'গুপ্ত' 'গুপ্তা' হয় মেয়েদের নামে,
দেখেছি অনেক চিঠি, পোষ্ট কার্ড, খামে।
সে নিয়মে যদি আজ 'ঘোষ' হয় 'ঘোষা',
তা হ'লে অনেক মেয়ে ক'রবেই গোসা,
'পালিত' 'পালিতা' হ'লে 'পাল' হ'লে 'পালা'
নির্ঘাৎ বাড়বেই মেয়েদের জ্বালা ;
'মল্লিক' 'মল্লিকা', 'দাস' হ'লে 'দাসা'
শোনাবে পদবীগুলো অতিশয় খাসা,
'কর' যদি 'করা' হয়, 'ধর' হয় 'ধরা',
মেয়েরা দেখবে এই পৃথিবীটা—"সরা"।
'নাগ' যদি 'নাগা' হয়, 'সেন' হয় 'সেনা',
বড়োই কঠিন হবে মেয়েদের চেনা॥

বিয়ে বাড়ীর মজা

বিয়ে বাড়ি : বাজছে সানাই, বাজছে নানান বাদ্য
একটি ধারে তৈরী হ'চ্ছে নানা রকম খাদ্য ;
হৈ-চৈ আর চেঁচামেচি, আসছে লুচির গন্ধ
আলোয় আলোয় খুশি সবাই, কান্নাকাটি বন্ধ,
বাসর ঘরে সাজছে ক'নে, সকলে উৎফুল্ল,
লোকজনকে আসতে দেখে কর্তার মুখ খুললো :
"আসুন, আসুন—বসুন সবাই, আজকে হ'লাম ধন্য,
যৎসামান্য এই আয়োজন আপনাদেরই জন্য ;
মাংস, পোলাও, চপ-কাটলেট, লুচি এবং মিষ্টি
খাবার সময় এদের প্রতি দেবেন একটু দৃষ্টি।"
বর আসেনি, তাই সকলে ব্যস্ত এবং উৎসুক,
আনন্দে আজ বুক সকলের নাচছে কেবল্ ধুক-ধুক্,
'হুলু' দিতে তৈরী সবাই, শাঁখ হাতে সব প্রস্তুত,
সময় চ'লে যাচ্ছে ব'লে মনটা ক'রছে খুঁত-খুঁত।
ভাবছে সবাই কেমন ক'রে বরকে ক'রবে জব্দ ;
হঠাৎ পাওয়া গেলো পথের মোড়ে গাড়ির শব্দ ;
'হুলু'-ধ্বনি উঠলো মেতে, শাঁখ বাজলো জোরে,
বরকে সবাই এগিয়ে নিতে গেলো পথের মোড়ে,
কোথায় বরের সাজসজ্জা? কোথায় ফুলের মালা?
সবাই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে পালা, পালা, পালা।
বর নয়কো, লাল-পাগড়ী পুলিশ আসছে নেমে!
বিয়ে বাড়ির লোকগুলো সব হঠাৎ উঠলো ঘেমে,
ব'ললে পুলিশ : এই কি কর্তা, ক্ষুদ্র আয়োজন?
পঞ্চাশ জন কোথায়? এযে দেখছি হাজার জন!
এমনি ক'রে চাল নষ্ট দুর্ভিক্ষের কালে?
থানায় চ'লো, কাজ কি এখন এইখানে গোলমালে?
কর্তা হ'লেন কাঁদো-কাঁদো, চোখেতে জল আসে,
গেটের পাশে জড়ো-হওয়া কাঙালীরা হাসে॥

রেশন কার্ড

রঘুবীর একদিন দিতে গিয়ে আড্ডা,
হারিয়ে ফেললো ভুলে রেশনের কার্ডটা ;
তারপর খোঁজাখুঁজি এখানে ও ওখানে,
রঘু ছুটে এলো তার রেশনের দোকানে,
সেখানে ব'ললো কেঁদে, হুজুর, চাই যে আটা—
দোকানী ব'ললো হেঁকে, চ'লবে না কাঁদা-কাটা,
হাটে মাঠে ঘাটে যাও, খোঁজো গিয়ে রাস্তায়
ছুটে যাও আড্ডায়, খোঁজো চারিপাশটায় ;
কিংবা অফিসে যাও এ রেশন এলেকার,
আমার মামার পিসে, কাজ করে ছেলে তার,
তার কাছে গেলে পরে সবই ঠিক হ'য়ে যাবে,
ছ'মাসের মধ্যেই নয়া এক কার্ড পাবে।
রঘুবীর বলে কেঁদে, ছ'মাস কী ক'রবো ?
ছ'মাস কি উপবাস ক'রে ধুঁকে ম'রবো ?
আমি তার ক'রবো কী ?—দোকানী উঠলো রেগে—
যা খুশি তা' ক'রো তুমি—ব'ললো সে অতি বেগে :
পয়সা থাকে তো খেও হোটেলে কি মেসেতে,
নইলে সটান্ তুমি যেতে পারো দেশেতে ॥

খাদ্য সমস্যার সমাধান

বন্ধু :

ঘরে আমার চাল বাড়ন্ত
তোমার কাছে তাই,
এলাম ছুটে, আমায় কিছু
চাল ধার দাও ভাই।

মজুতদার :

দাঁড়াও তবে, বাড়ির ভেতর
একটু ঘুরে আসি,
চালের সঙ্গে ফাউও পাবে
ফুটবে মুখে হাসি।

মজুতদার :

এই নাও ভাই, চাল কুমড়ো,
আমায় খাতির করো,
চালও পেলে কুমড়ো পেলে
লাভটা হ'লো বড়ো॥

পুরোনো ধাঁধা

বলতে পারো বড়োমানুষ মোটর কেন চড়বে ?
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে ?
বড়োমানুষ ভোজের পাতে ফেলে লুচি-মিষ্টি,
গরীবরা পায় খোলামকুচি, একি অনাসৃষ্টি ?
বলতে পারো ধনীর বাড়ী তৈরী যারা করছে,
কুঁড়েঘরেই তারা কেন মাছির মতো মরছে ?
ধনীর মেয়ের দামী পুতুল হরেক রকম খেলনা,
গরীব মেয়ে পায় না আদর, সবার কাছে ফ্যালনা।
বলতে পারো ধনীর মুখে যারা যোগায় খাদ্য,
ধনীর পায়ের তলায় তারা থাকতে কেন বাধ্য ?
'হিং-টিং-ছট্' প্রশ্ন এসব, মাথার মধ্যে কামড়ায়,
বড়লোকের ঢাক তৈরী গরীব লোকের চামড়ায় ॥

ব্ল্যাক মার্কেট

হাত করে মহাজন, হাত করে জোতদার,
ব্ল্যাক-মার্কেট করে ধনী রাম পোদ্দার
গরীব চাষীকে মেরে হাতখানা পাকালো
বালিগঞ্জেতে বাড়ী খান ছয় হাঁকালো।
কেউ নেই ত্রিভুবনে, নেই কিছু অভাবও
তবু ছাড়লো না তার লোক-মারা স্বভাব ও।
একা থাকে, তাই হরি চাকরটা রক্ষী
ত্রিসীমানা মাড়ায় না তাই কাক-পক্ষী
বিশ্বে কাউকে রাম কাছে পেতে চান্ না,
হরিই বাজার করে, সে-ই করে রান্না।
এমনি করেই বেশ কেটে যাচ্ছিলো কাল,
হঠাৎ হিসেবে রাম দেখলেন গোলমাল,
বললেন চাকরকে : কিরে ব্যাটা, কি ব্যাপার ?
এতো টাকা লাগে কেন বাজারেতে রোজ-কার ?
আলু তিন টাকা সের ? পটল পনেরো আনা ?
ভেবেছিস বাজারের কিছু বুঝি নেই জানা ?
রোজ রোজ চুরি তোর ? হতভাগা, বজ্জাত !
হাসছিস ? এক্ষুনি ভেঙে দেবো সব দাঁত,
খানিকটা চুপ করে বললো চাকর হরি :
আপনারই দেখাদেখি ব্ল্যাক-মার্কেট করি ॥

ভালো খাবার

ধনপতি পাল, তিনি জমিদার মস্ত ;
সূর্য রাজ্যে তাঁর যায় নাকো অস্ত
তার ওপর ফুলে উঠে কারখানা-ব্যাঙ্কে
আয়তনে হারালেন মোটা কোলা ব্যাঙকে।
সবার "হুজুর" তিনি, সকলের কর্তা,
হাজার সেলাম পান দিনে গড়-পড়তা।
সদাই পাহারা দেয় বাইরে সিপাই তাঁর,
কাজ নেই, তাই শুধু 'খাই-খাই' বাই তাঁর।
এটা খান, সেটা খান, সব লাগে বিদ্ঘুটে,
টান মেরে ফেলে দেন একটু খাবার খুঁটে ;
খাদ্যে অরুচি তাঁর, সব লাগে তিক্ত,
খাওয়া ফেলে ধমকান শেষে অতিরিক্ত।
দিনরাত চিৎকার : আরো বেশি টাকা চাই,
আরো কিছু তহবিলে জমা হ'য়ে থাকা চাই।
সব ভয়ে জড়োসড়ো, রোগ বড়ো প্যাঁচানো,
খাওয়া ফেলে দিনরাত টাকা ব'লে চ্যাঁচানো।
ডাক্তার কবিরাজ ফিরে গেলো বাড়িতে ;
চিন্তা পাকালো জট নায়েবের দাড়িতে।
নায়েব অনেক ভেবে বলে হুজুরের প্রতি :
কী খাদ্য চাই ? কি সে খেতে উত্তম অতি ?
নায়েবের অনুরোধে ধনপতি চারিদিক
দেখে নিয়ে, বার কয় হাসলেন ফিক্-ফিক্ ;
তারপর ব'ললেন : বলা ভারি শক্ত,
সবচেয়ে ভালো খেতে গরীবের রক্ত ॥

পৃথিবীর দিকে তাকাও

দেখো ওই মোটা লোকটাকে দেখো
অভাব জানে না লোকটা,
যা কিছু পায় সে আঁকড়িয়ে ধরে
লোভে জ্বলে তার চোখটা।
মাথা উঁচু করা প্রাসাদের সারি
পাথরে তৈরি সব তার,
কতো সুন্দর, পুরোনো এগুলো !
অট্টালিকা এ লোকটার।
উঁচু মাথা তার আকাশ ছুঁয়েছে
চেয়ে দেখে না সে নীচুতে,
কতো জমির যে মালিক লোকটা
বুঝবে না তুমি কিছুতে।
দেখো, চিমনীরা কী ধোঁয়া ছাড়ছে
কলে আর কারখানাতে,
মেশিনের কপিকলের শব্দ
শোনো, সবাইকে জানাতে।
মজুররা দ্রুত খেটেই চলেছে—
খেটে খেটে হল হন্যে ;
ধনদৌলত বাড়িয়ে তুলছে
মোটা প্রভুটির জন্যে।
দেখো একজন মজুরকে দেখো
ধুঁকে ধুঁকে দিন কাটছে,
কেনা গোলামের মতই খাটুনি
তাই হাড়ভাঙা খাটছে।
ভাঙা ঘর তার নীচু ও আঁধার
স্যাঁতসেঁতে আর ভিজে তা,

পৃথিবীর দিকে তাকাও

এর সাথে কি তুলনা করবে
প্রাসাদ বিশ্ব-বিজেতা ?
কুঁড়েঘরের মা সারাদিন খাটে
কাজ করে সারা বেলা এ,
পরের বাড়িতে ধোয়া মোছা কাজ—
বাকীটা পোষায় সেলায়ে।
তবুও ভাঁড়ার শূন্যই থাকে,
থাকে বাড়ন্ত ঘরে চাল,
বাচ্চা ছেলেরা উপবাস করে
এমনি করেই কাটে কাল।
বাবু যত তারা মজুরকে তাড়া
করে চোখে চোখে রাখে,
ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে মজুরকে ধরে
দোকানে যাওয়ার ফাঁকে।
খাওয়ার সময় ভোঁ বাজালে তারা
ছুটে আসে পালে পাল,
খায় শুধু কড়কড়ে ভাত আর
হয়ত একটু ডাল।
কম-মজুরির দিন ঘুরে এলে
খাদ্য কিনতে গিয়ে,
দেখে এ টাকায় কিছুই হয় না,
বসে গালে হাত দিয়ে।
পুরুত শেখায়, ভগবানই জেনো প্রভু
(সুতরাং চুপ ; কথা বলবে না কভু)
সকলেরই প্রভু—ভাল আর খারাপের
তাঁরই ইচ্ছায় এ ; চুপ কর সব ফের।

পৃথিবীর দিকে তাকাও

শিক্ষক বলে, শোন সব এই দিকে,
চালাকি করো না, ভাল কথা যাও শিখে
এদের কথাতে ভরসা হয় না তবু?
সরে এস তবে, দেখো সত্যি কে প্রভু।
ফ্যাকাশে শিশুরা, মুখে শাস্তির ভীতি,
আগের মতই মেনে চলে সব নীতি।
যদি মজুরেরা কখনো লড়তে চায়
পুলিশ প্রহারে জেলে টেনে নিয়ে যায়।
মজুরের শেষ লড়াইয়ের নেতা যতো
এলোমেলো সব মিলায় ইতস্তত—
কারা-প্রাচীরের অন্ধকারের পাশে।
সেখানেও স্বাধীনতার বার্তা আসে।
রাশিয়াই, শুধু রাশিয়া মহান দেশ,
যেখানে হয়েছে গোলামির দিন শেষ;
রাশিয়া, যেখানে মজুরের আজ জয়,
লেনিন গড়েছে রাশিয়া! কী বিস্ময়!
রাশিয়া, যেখানে ন্যায়ের রাজ্য স্থায়ী,
নিষ্ঠুর 'জার' যেই দেশে ধরাশায়ী,
সোভিয়েট-'তারা' যেখানে দিচ্ছে আলো,
প্রিয়তম সেই মজুরের দেশ ভাল।
মজুরের দেশ, কল-কারখানা,
প্রাসাদ, নগর, গ্রাম,
মজুরের খাওয়া, মজুরের হাওয়া,
শুধু মজুরের নাম।
মজুরের ছুটি, বিশ্রাম আর
গরমে সাগর-ধার,

পৃথিবীর দিকে তাকাও

মজুরের কত স্বাধীনতা ! আর
অজস্র অধিকার ।
মজুরের ছেলে ইস্কুলে যায়
জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে,
ছোট ছোট মন ভরে নেয় শুধু
জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে ।
মজুরের সেনা 'লাল ফৌজ' দেয়
পাহারা দিন ও রাত,
গরিবের দেশে সইবে না তারা
বড়োলোকদের হাত ।
শান্ত-স্নিগ্ধ, বিবাদ-বিহীন
জীবন সেখানে, তাই
সকলেই সুখে বাস করে আর
সকলেই ভাই ভাই ;
এক মনেপ্রাণে কাজ করে তারা
বাঁচাতে মাতৃভূমি,
তোমার জন্যে আমি, সেই দেশে,
আমার জন্যে তুমি ।

সিপাহী বিদ্রোহ

হঠাৎ দেশে উঠলো আওয়াজ—"হো-হো, হো-হো, হো-হো"
চমকে সবাই তাকিয়ে দেখে—সিপাহী বিদ্রোহ !
আগুন হয়ে সারাটা দেশ ফেটে পড়লো রাগে,
ছেলে বুড়ো জেগে উঠলো নব্বই সন আগে ;
একশো বছর গোলামিতে সবাই তখন ক্ষিপ্ত,
বিদেশীদের রক্ত পেলে তবেই হবে তৃপ্ত ?
নানাসাহেব, তাঁতিয়াটোপি, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মী—
সবার হাতে অস্ত্র ; নাচে বনের পশু-পক্ষী।
কেবল ধনী, জমিদার, আর আগের রাজার ভক্ত
যোগ দিলো, তা নয়কো, দিলো গরীবেরাও রক্ত !
সবাই জীবন তুচ্ছ করে, মুসলমান ও হিন্দু,
সবাই দিতে রাজি তাদের প্রতি রক্ত বিন্দু ;
ইতিহাসের পাতায় তোমরা পড়ো কেবল মিথ্যে,
বিদেশীরা ভুল বোঝাতে চায় তোমাদের চিত্তে।
অত্যাচারী নয়কো তারা, অত্যাচারীর মুণ্ড
চেয়েছিলো ফেলতে ছিঁড়ে জ্বালিয়ে অগ্নি-কুণ্ড।
নানা জাতের নানান্ সেপাই গরীব এবং মূর্খ ঃ
সবাই তারা বুঝেছিলো অধীনতার দুঃখ ;
তাই তো তারা স্বাধীনতার প্রথম লড়াই লড়তে
এগিয়েছিলো, এগিয়েছিলো মরণ বরণ করতে !

আজকে যখন স্বাধীন হবার শেষ লড়াইয়ের ডঙ্কা
উঠছে বেজে, কোনো দিকেই নেইকো কোনো শঙ্কা ;
জব্বলপুরে সেপাইদেরও উঠছে বেজে বাদ্য
নতুন করে বিদ্রোহ আজ ; কেউ নয়কো বাধ্য,
তখন এঁদের স্মরণ করো, স্মরণ করো নিত্য—
এঁদের নামে, এঁদের পণে শানিয়ে তোলো চিত্ত।
নানাসাহেব, তাঁতিয়াটোপি, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মী,
এঁদের নামে, দৃপ্ত কিশোর, খুলবে তোমার চোখ কি ?

আজব লড়াই

ফেব্রারী মাসে ভাই, কলকাতা শহরে
ঘটলো ঘটনা এক, লম্বা সে বহরে,
লড়াই লড়াই খেলা শুরু হলো আমাদের,
কেউ রইলো না ঘরে রামাদের শ্যামাদের ;
রাস্তার কোণে কোণে জড়ো হলো সকলে
তফাৎ রইলো নাকো আসলে ও নকলে,
শুধু শুনি 'ধর' 'ধর' 'মার' 'মার' শব্দ
যেন খাঁটী যুদ্ধ এ, মিলিটারী জব্দ।
বড়োরা কাঁদুনে গ্যাসে কাঁদে, চোখ ছল ছল
হাসে ছিঁচকাঁদুনেরা বলে, 'সব ঢাল জল'।
ঐ বুঝি ওরা সব সঙ্গীন উঁচোলো,
ভয় নেই, যত হোক বেয়নেট ছুঁচোলো,
ইঁট-পাটকেল দেখি রাখে এরা তৈরী,
এইবার যাবে কোথা, বাছাধন বৈরী,
ভাবো বুঝি ছোট ছেলে, একেবারে বাচ্চা !
এদের হাতেই পাবে শিক্ষাটা আচ্ছা ;
ঢিল খাও, তাড়া খাও, পেট ভরে কলা খাও,
গালাগালি খাও আর খাও কানমলা খাও।
জালে ঢাকা গাড়ি চড়ে বীরত্ব কি যে এর
বুঝবে কে, হরদম সামলায় নিজেদের।

বর্মা-পালানো সব বীর এরা বঙ্গে
যুদ্ধ করছে ছোট ছেলেদের সঙ্গে ;
ঢিলের ভয়েতে ওরা চালায় মেশিনগান,
"বিশ্ববিজয়ী" তাই রাখে জান, বাঁচে মান।
খালি হাতে ছেলেদের তেড়ে গিয়ে করে খুন
সাবাস ! সাবাস ! ওরা খেয়েছে রাজার নুন।

আজব লড়াই

ডাং গুলি খেলা নয়, গুলির সঙ্গে খেলা,
রক্ত রাঙানো পথে দু পাশে ছেলের মেলা ;
দুর্দম খেলা চলে, নিষেধে কে কান দেয় ?
ও-বাড়ি ও ও-পাড়ার কালো, ছোটু প্রাণ দেয়
স্বচক্ষে দেখলাম বস্তির আলী জান,
'আংরেজ চলা যাও' বলে ভাই দিলো প্রাণ।

এমন বিরাট খেলা শেষ হলো চট পট
বড়োদের বোকামিতে আজো প্রাণ ছটফট ;
এইবারে আমি ভাই হেরে গেছি খেলাতে,
ফিরে গেছি দাদাদের বকুনির ঠেলাতে ;
পরের বারেতে ভাই শুনবো না কারো মানা,
দেবোই, দেবোই আমি নিজের জীবনখানা ॥